Android Coding Bd

সপ্তম অধ্যায়
১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ১১ দফা আন্দোলন

বাংলাদেশে অনেক গণআন্দোলন হয়েছে তবে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনকেই একমাত্র ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানরূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এর একটি কারণ বোধহয় এই যে ১৯৫২ সালের পর গণতন্ত্র রক্ষায় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এটিই ছিল একমাত্র আন্দোলন যা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

১৯৬৯ সালের ঘটনাবলিই ১৯৬৯ সালের পটভূমি তৈরি করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখ করতে হয় ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের কথা। ঐ সময় অনবরত এ প্রচারই বারবার করা হয় যার মূল কথা হলো- "ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির চেয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের আলোকে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাসের আকাঙ্খাই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের মূল কথা।

১৯৬৯ সালের যুদ্ধ শেষ হলো তাশখন্দ চুক্তির মাধ্যমে। পাকিস্তান যে কাঙ্খিত জয় পায়নি তার প্রমাণ তাশখন্দ চুক্তি করতে বাধ্য হওয়া। এ অঞ্চলের বাঙালি এতো প্রচার প্রপাগান্ডার পরও অনুধাবন করতে পেরেছিল পূর্ব পাকিস্তানকে অরক্ষিত রাখা হয়েছে। ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করত তাহলে নিমিষেই তা দখল করতে পারত। এতদিন কেন্দ্রীয় সরকার যে তত্ত্ব দিয়ে আসছিল তা হলো, পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা পশ্চিম পাকিস্তানে নিহিত। এখন দেখা গেল তা শূন্যগর্ভ বক্তব্য মাত্র। পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ এভাবে অভিঘাত ফেলেছিল বাঙালির ওপর।

এরপর বঙ্গবন্ধু প্রচার করলেন ছয়দফা। স্বায়ত্ত্বশাসনের এই দাবি মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল। ১৯৬৮ সালে শুরু হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। শেখ মুজিবুর রহমান মামলার জবানবন্দীতে যা বলেছিলেন আসলে তাই ছিল যথার্থ কারণ-

> "কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।"

বাঙালির ধারণাও তা ছিল। এ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করলাম না।

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত আরো কিছু ঘটনা ঘটেছে তা মূলত সাংস্কৃতিক

Android Coding Bd

কিন্তু তাও মানুষের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। অধ্যাপক জয়ন্তকুমার রায় ও অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন তাদের লেখা বাংলাদেশ সিভিল সমাজের আন্দোলন গ্রন্থে লিখেছেন-

> রাজনৈতিক ফ্রন্টের ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও এ সময় এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা পূর্ব বঙ্গবাসীর বাঙালিবোধকে তীব্র ও সংহত করে তোলে এবং এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বুদ্ধিজীবীরা। এখানে লক্ষণীয় যে, ১৯৪৭ থেকে এখন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে সব সময় একটি আদর্শগত লড়াই চলেছে। গত ৪৬ বছরে অধিকাংশ সময় ক্ষমতায় ছিল যে সব সরকার তারা সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সিভিল সমাজকে দমিত করতে চেয়েছে। অন্য দিকে, মধ্যবর্তী কারকরা সব সময় এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছে যাতে সায় দিয়েছে সাধারণ মানুষ। এ লড়াইয়ে প্রগতির ধারা জয়ী হয়েছে এবং বাঙালিবোধকে সব সময় বাঁচিয়ে রেখে রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।"

সংস্কৃতির এ বিষয়টি সবাই উপেক্ষা করেছেন ইতিহাস রচনায় যা যৌক্তিক নয়।

এসব ঘটনার প্রথমটি হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিষিদ্ধ করা। জাতীয় সংসদে মুসলিম লীগ নেতা ও ১৯৭১ সালে দালাল খান এ সবুর উল্লেখ করেন, ১ বৈশাখ ও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন বিদেশি [অর্থাৎ হিন্দু] সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। তথ্য মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন বলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার রেডিও থেকে প্রায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পাকিস্তানি আদর্শের সঙ্গে না মিললে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। খাজা শাহাবুদ্দিনের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে কিছু বুদ্ধিজীবী সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এদের মূল বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে দৈনিক আজাদ-এ–

> "রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীতে মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির জয়গান গাহিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই এই সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও-টেলিভিশনকে পবিত্র রাখার প্রয়োজন ছিল।

বাঙালি এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এবং প্রবল ভাবে ঐ বছর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করে। এটি ছিল পশ্চিমা ও তার সহযোগীদের ইসলামের নামে সাংস্কৃতিক নিপীড়নে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

এরপর বাংলা ভাষা সংস্কার করে 'জাতীয় ভাষা' সৃষ্টির প্রয়াস পায়।

১৯৬৮ সালে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য সুপারিশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল। আইয়ুব খানও এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন যার মূল কথা, "সকল আঞ্চলিক ভাষা একত্রিত করে যৌথভাবে একটি মহান পাকিস্তানী ভাষা উদ্ভাবন করা। এবারও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, বুদ্ধিজীবীসহ অন্যান্যরা প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন। সিভিল সমাজের প্রতিবাদে এবারও পিছু হটে যায় সরকার। এ পটভূমিতে ১৯৬৮ সালে, লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ, মীর্জা গালিব, ইকবাল, মাইকেল মধুসূদন ও কাজী নজরুলের ওপর পাঁচ দিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আবুল হাশিম বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন– "যাহারা ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের নামে রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের ওকালতি করিতেছেন, তাহারা শুধুই মূর্খ নহেন, দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিতও। তাঁহারা না বোঝেন রবীন্দ্রনাথ, না বোঝেন ইসলাম। তাহারা

Android Coding Bd

একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া রবীন্দ্র-বিরোধিতায় মাতিয়া উঠিয়াছেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এগিয়ে নিয়েছে। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় ১৮ জানুয়ারি। ১৯ জানুয়ারি জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা নেমে আসে রাস্তায়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যে আলোচনা শুরু করেন ছয় দফা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে। আরো কিছু ঘটনা এ সময় ঘটে যা সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তপ্ত করে তোলে। মওলানা ভাসানী হরতালের আহবান জানান। ডিসেম্বরে কয়েকটি সফল হরতাল হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় কয়েকজন। এ পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী 'ঘেরাও কর্মসূচী' নামে নতুন এক আন্দোলনের ডাক দেন বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ডাকসু ও চারটি ছাত্র সংগঠনের সাতজন নেতা প্রণীত ১১ দফা কর্মসূচী। ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ১১ দফা ঘোষণা করেন। মূলত ৬ দফার বিস্তারিত রূপই ১১ দফা। কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বাঙালিদের আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার অর্জনই ছিল এর মূল বক্তব্য। এগারো দফার সংক্ষিপ্ত সার এখানে দেয়া হলো-

১. সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। ছাত্র-বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। হল হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলাভাষা চালু করিতে হইবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে। ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কনসেশনে' টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাকুরির নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে।

৩. পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম। ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা-এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ। দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি

Android Coding Bd

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে। সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহি:বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহি:বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকিবে। পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করত সাব-ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫. ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হইবে।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি-বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮. পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারের আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি; গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

[সূত্র : স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫-৪০৮। দলিলপত্র গ্রন্থে ১১ দফা বিস্তারিত উল্লেখিত আছে। মাহবুবর রহমান এ-বাংলাদেশের ইতিহাস]

ঘোষণার তিনদিন পর ৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, জামায়াতে ইসলামী, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট একটি যৌথ ফ্রন্ট গঠন করে। আইয়ুববিরোধী এ মোর্চার নাম দেয়া হয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' বা 'ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি' বা 'ডাক'।

ন্যাপ ভাসানী ও ভুট্টোর পিপলস পার্টি এতে যোগ দিতে অস্বীকার করে। 'ডাক' ও ঘোষণা দেয় ৮ দফার। তারা দেশে "(ক) ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা কায়েম (খ) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, (গ) অবিলম্বে জরুরি অবস্থা

Android Coding Bd

প্রত্যাহার (ঘ) পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা। সমস্ত কলাকানুন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল (ঙ) খান আবদুল ওয়ালী খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দী, রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত সব গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার (চ) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারার আওতায় জারীকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার (ছ) শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা (জ) নতুন ডিক্লারেশন দানের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার.... দাবি করেন। মওলানা ভাসানী ১৪ জানুয়ারি হাতিরদিয়ায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন "জনসাধারণের ভোটাধিকার, লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে আমরা খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিব।"

শেখ মুজিবের ৬ দফা, ছাত্রদের ১১ দফা ও রাজনৈতিক দলের ৮ দফা বাঙালিকে আবার উজ্জীবিত করে তোলে। ৬ দফা ও ৮ দফা, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ১১ দফার মধ্যেই ছিল। ঐ সময় ছাত্ররা ছিলেন চালিকাশক্তি। তাই আমরা দেখি আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্রদের হাতেই। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে ছাত্ররা যে আন্দোলনের শুরু করে ১৯৬৯ সালের শুরুতেই দেখা যায় তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

১৭ জানুয়ারি, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘটের মাধ্যমে কর্মসূচী ঘোষণা করে। এর আগেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিলো। পুলিশ যথারীতি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রদের উপর। ১৮ জানুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাকা হয় ধর্মঘট। পুলিশী নির্যাতন অব্যাহত রাখা হয়। এ সময় সরকারী ছাত্রদল এনএসএফ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ২০ জানুয়ারি এক মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার সময় ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়।

আসাদের শহীদ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আন্দোলনের চরিত্র পালটে যায়। বিকালে এক বিশাল শোক মিছিল ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। ২১ তারিখ হরতাল ঘোষণা করা হয়। ঐ দিনও পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। বিকেলে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় গায়েবানা জানাজা। তারপর আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে বের হয় লক্ষাধিক লোকের মিছিল। লিখলেন কবি শামসুর রাহমান–

"আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।"

২১ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় প্রতিদিনই মিছিল হয়েছে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু সিভিল সমাজ ক্ষুব্ধ হলে কি করতে পারে তার উদাহরণ ২৪ মার্চ। ঢাকা শহরের রাস্তায় সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক নেমে আসে। পুলিশের গুলিতে নিহত হন ছাত্র মতিয়ুর, শ্রমিক রুস্তম। তৎকালীন ইকবাল হলের মাঠে লক্ষাধিক শোকাভিভূত জনতার সামনে মতিয়ুরের বাবা সামান্য একজন ব্যাংক কর্মচারী ঘোষণা করেন "এক মতিয়ুরকে

Android Coding Bd

হারিয়ে আজ আমি হাজার মতিয়ুর পেয়েছি।" পরদিনও ইপিআর পুলিশ বাহিনীর তাণ্ডব ও গুলিবর্ষণে এক মহিলা নিহত হন।

আইয়ুব খান পরিস্থিতি বুঝে আলোচনার প্রস্তাব দেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করে রাজবন্দীদের জেলে রেখে আলোচনা হবে না। ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকায় এলে কালো পতাকায় ঢাকা শহর ছেয়ে যায়। তাঁর কুশপুত্তলিকা ও বই পোড়ানো হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় শুধু রাজবন্দীদের মুক্তি নয়, মোনায়েম খাঁরও পদত্যাগ দাবি করা হয় এবং ১১ দফা আন্দোলন চালিয়ে যাবার পক্ষে শপথ গ্রহণ করে ছাত্র-জনতা। জনতার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু স্থানের নামকরণে। আইয়ুব নগরের নাম হয়ে যায় শেরে বাংলা নগর, আইয়ুব গেটের নাম রাখা হয় আসাদগেট, আইয়ুব চিলড্রেনস পার্কের নামকরণ করা হয় মতিয়ুর শিশুপার্ক।

১২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকা ত্যাগ করলে 'ডাক' ১৪ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল আহ্বান করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্যান্টনমেন্টে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। মানুষ আবার রাস্তায় নেমে আসে। পল্টন ময়দানে মাওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, প্রয়োজনে জেলের তালা ভেঙ্গে শেখ মুজিবকে মুক্ত করা হবে। সে মুহূর্তে নতুন এক স্লোগানের জন্ম নেয়, 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।' সার্জেন্ট জহুরুল হকের গায়েবানা জানাজা শেষে লক্ষ মানুষ ঢাকার রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেয় দু'জন প্রাদেশিক মন্ত্রী, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ও আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতি এস,এ রহমানের বাসভবনে। শহরের পুরো নিয়ন্ত্রণ চলে যায় জনতার হাতে। সন্ধ্যায় জারি করা হয় কার্ফ্যু।

১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকে সেনাবাহিনী বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। রাতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা শহরে। কার্ফ্যু ভেঙ্গে মানুষ নেমে আসে রাস্তায়। সরকারী সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে পড়ে। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি দেয়া হয় রাজবন্দীদেরও। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা দেওয়া হয় শেখ মুজিবকে। লক্ষ মানুষের সমাবেশে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন ১১ দফা তিনি সমর্থন করেন কারণ এর মধ্যে অন্তর্গত ৬ দফাও। ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ জনতার পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে ভূষিত করেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে।

শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই নয়, পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানেও। লান্ডিকোটাল থেকে কিছু ছাত্র চোরাপথে আনীত কিছু পণ্য কিনে ফেরার পথে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের জের ধরে জুলফিকার আলী ভুট্টো দৃশ্যপটে আসেন। এবং পূর্ব পাকিস্তানের মতো একইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। তবে, তা পূর্ব পাকিস্তানের মাত্রায় পৌঁছেনি। এখানে উল্লেখ্য যে, উনসত্তরের ঘটনাবলী যা উনসত্তরের গণআন্দোলন নামে খ্যাত তা শুধু ঢাকাতেই কেন্দ্রীভূত থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিলো পুরো পূর্ব পাকিস্তানে এবং তা গ্রহণ করেছিলো সহিংস রূপ। এ প্রসঙ্গে পরে

Android Coding Bd

আলোচনা করবো।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেছিলেন, সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি মেনে নিয়েছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিলো, এমনকি আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে না দাঁড়ানোরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মত এর বিপক্ষে ছিল। মুক্তি পাবার পর শেখ মুজিবকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাঁদের আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব সম্মত হলেন গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে। এবং 'ডাক' নেতৃবৃন্দকে নিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকে বসলেন। মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠকের বিরোধিতা করে এতে যোগ দেননি। অন্তিমে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। ঢাকা ফিরে এসে ১৪ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা পেলে তিনি ৬ দফা আদায় করে আসতে পারতেন। তা পারেননি বলেই বৈঠক ত্যাগ করেছেন। অসহযোগী যে কজন নেতাকে তিনি কুচক্রী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা হলেন– হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুস সালাম খান, ফরিদ আহমদ ও মাহমুদ আলী।

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। সম্পূর্ণ সিভিল সমাজ অস্থির, উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মোনায়েম খানের অপসারণের দাবিতে হরতাল আহ্বান করা হয়। ২১ মার্চ ড. এম এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এর আগে রাতে সপরিবারে মোনায়েম খান পালিয়ে যান। ২৪ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানে আবার জারি করা হয় সামরিক আইন।

বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে সিভিল সমাজের সফল উত্থান হয়েছিলো ১৯৬৯ সালে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুবী শাসন থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সিভিল সমাজ মাঝে মাঝে পিছু হটেছে বটে কিন্তু পর্যুদস্ত হয়নি। প্রাথমিক কারকরা প্রথম পর্যায়ে দোদুল্যমানতা, ভয় ও স্বার্থদ্বন্দ্বে মনপ্রাণ দিয়ে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হননি। কিন্তু বাংলাদেশের সিভিল সমাজের অন্তর্নিহিত একটি শক্তি আছে যা প্রবাহিত হয় ফল্গুধারার মতো। এ ফল্গুধারার উৎস মধ্যবর্তী কারকদের অগ্রসরমান অংশ সংস্কৃতিকর্মী ও ছাত্ররা যা সব সময় সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে এবং কখনও পিছু হটেনি। গোটা উনসত্তরের আন্দোলন ছাত্ররাই সংগঠন করেছে, অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের বাধ্য করেছে ঐক্যবদ্ধ হতে। অন্তিমে, মধ্যবর্তী কারক ও প্রান্তিককারকদের চাপে পড়ে রাজনৈতিক নেতারা তাদের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এবং সিভিল সমাজ সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা বা বাংলাদেশ গঠনকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার যাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিলো তিনি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান যিনি অচিরেই পরিচিত হয়ে উঠলেন বাংলার বন্ধু বা 'বঙ্গবন্ধু' নামে। বাংলাদেশে সিভিল সমাজের প্রতীক হয়ে উঠলেন তিনি।

Android Coding Bd

Android Coding Bd

১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠায় কতোজন আত্মাহুতি দিয়েছেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। মোহাম্মদ হাননান বিভিন্ন সূত্র থেকে একটি হিসাব দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর হিসাব অনুযায়ী এই এক দশকে নিহত হয়েছেন ১২১ জন। এবং এর মধ্যে ৬৯ সালেই ৬১ জন। ৬১ জনের পেশাওয়ারী ভাগ এ রকম–

শ্রমিক	২৯	সৈনিক	১
ছাত্র	২১	গৃহবধূ	১
কৃষক	৩	অজ্ঞাত	১
শিক্ষক	২		
চাকুরিজীবী	৩		

এখানে অবশ্য উল্লেখ করতে হয় স্বাধীনতার দলিলপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৬৯ সালে নিহতের সংখ্যা প্রায় ১০০ জন। সুতরাং ঐ ভিত্তিতে জনাব হান্নানের হিসাবের সঙ্গে আরো ৩১ জন যোগ করনে ৯ বছরে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫২ জন। ১৯৬৯ সালের নিহতের মধ্যে ছিলেন ৩৪ জন শ্রমিক, ২০ জন ছাত্র, ৭ জন সরকারি কর্মচারী, ৫ জন খুদে ব্যবসায়ী ও একজন স্কুল শিক্ষক।

লক্ষণীয় যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রান্তিক কারকরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলো। অনেক সময় তা সহিংস রূপ ধারণ করেছিলো। মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত ধ্বংস করার জন্য ছাত্রনেতারা আন্দোলনের সময় মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে বলেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে, অনেক জায়গায় মৌলিক গণতন্ত্রীরা পদত্যাগে রাজি না হলে মানুষ তাদের বাধ্য করেছিলো পদত্যাগ করতে। মৌলিক গণতন্ত্রীদের সুনজরে দেখার কোনো কারণ ছিল না। অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তারা রাজনৈতিক শক্তিরও অধিকারী হয়েছিলো। এবং এ দুটির মিলিত শিকার ছিল বঞ্চিত গ্রামবাসীরা। এ ছাড়া, চোর, ডাকাত, গরু চোর, টাউট এবং মৌলিক গণতন্ত্রীদের দালালদের অনেক ক্ষেত্রে গণআদালতে বিচার করে শাস্তি দেয়া হচ্ছিলো। অন্যদিকে স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তি এ সুযোগে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য লুটপাটে অংশ নিচ্ছিলো। ছাত্র বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিলো ঘটনাবলী এবং এতে তারা হয়ে উঠেছিলেন উদ্বিগ্ন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রায় দশ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন। এর মধ্যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগকারীর সংখ্যা ছিল ২৫০০ থেকে ৩০০০ মাত্র।

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সূচনা ছাত্ররা করলেও মওলানা ভাসানী ছিলেন এর প্রাণপুরুষ। ১৯৬৩ সাল থেকে তিনি ছিলেন আইয়ুবের প্রচ্ছন্ন সমর্থক। হয়তো তাঁর ধারণা হয়েছিলো, চীনের সঙ্গে আইয়ুব খান বন্ধুত্ব করছেন, সুতরাং হয়তো পাকিস্তানেও সমাজতন্ত্রের উপাদানাবলীর ওপর গুরুত্ব দেবেন। ১৯৬৯ সালেই এ ধারণা তিনি পাল্টে ফেললেন এমনকি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানেরও বিরোধিতা করলেন। মফস্বলে মওলানা ভাসানী ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন যা আন্দোলনকে এক ধরনের বিপ্লবী ভাব দিয়েছিলো। 'ঘেরাও'র অর্থ দাবি আদায়ের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা

Android Coding Bd

ভূস্বামীর বাসগৃহ ঘেরাও এবং তাকে দাবি মানতে বাধ্য করা। ভাসানী সব সময় সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের কথা বলতেন, কিন্তু ঐ ধরনের লক্ষ্যে পৌছার জন্য যে ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা, বৈপ্লবিক সুসংগঠিত সংগঠন ও নীতি লাগে, লাগে স্থিরতা ও ধৈর্য্য তার ছিল না। ফলে, ঘেরাও হয়ে দাঁড়ালো জনতার স্বতঃস্ফূর্ত তাৎক্ষণিক মোকাবিলা করার হাতিয়ার যা এক সময় ভাসানীর নিয়ন্ত্রণেও রইলো না। আর ভাসানীর সমাজতন্ত্র ছিল ইসলামী সমাজতন্ত্র। ধর্মের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ মিশ্রণ হলে সমাজতন্ত্রের মৌল বৈশিষ্ট্যই পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভাসানীর সারাটা রাজনৈতিক জীবন এ রকম বৈপরীত্যে ভরা। ১৯৫৬ সালের দিকেই ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। আবার ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ৬ দফার বিরোধিতা করেছিলেন যা ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবি। আইয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খান যখন সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন তখন ভাসানী নির্বাচনে যোগ দিতে অনীহা প্রকাশ করলেন। হয়তো ভোটের থেকে সে মুহূর্তে তাঁর কাছে ভাতের দাবি বড় মনে হয়েছিলো বা সংসদীয় শান্তির বদলে অবিশ্রান্ত আন্দোলন চেয়েছিলেন। এ দিক বিবেচনা করলে ভাসানীর মধ্যে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের দুর্বলতার দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রতীকের মতো। সেগুলি হলো– প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকের দোদুল্যমানতা, বিভ্রান্তি, সিদ্ধান্তহীনতা। ভাসানী তাঁর এই বৈপরীত্য ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন ন্যাপের ছাত্র সংগঠনে যা ১৯৭০ সালে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ছাত্রলীগ। জাতীয়তাবাদী ধারা বেগবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রলীগও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো এবং ১৯৭০ সাল থেকে তারা স্বাধীন বাংলাদেশের কথা বলা শুরু করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলো, সিভিল সমাজ সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে তখন, যখন সমাজের তিনটি পর্যায়ের দাবি ও ক্ষোভ একই মোহনায় মিশেছে। এবং এতে মধ্যবর্তী কারকরা, বিশেষ করে ছাত্ররা পালন করেছে সংযোগকারীর ভূমিকা। তবে প্রান্তিক পর্যায়কে আন্দোলনে সংযুক্ত না করা পর্যন্ত সিভিল সমাজের স্বপ্ন সে ভাবে পূরণ হয়নি। বাংলাদেশে এখনও যখন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কথা ওঠে, তখনই সবার মনে ভেসে ওঠে ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের কথা।

সহায়ক গ্রন্থ

লেনিন আজাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা, ১৯৯৭
মেসবাহ কামাল, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : শহীদ আসাদ ও শ্রেণী-রাজনীতি প্রসঙ্গ*, ঢাকা ১৯৮৬
মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা ২০১৩ [নতুন সংস্করণ]
মোহাম্মদ ফরহাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, ঢাকা, ১৯৮৯।